PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-14, No.-1, May 2023

নবনীতা দেবসেনের রামায়ণী গল্প

ত্রিসপ্ত প্রদীপ [1*]

[1*] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: trisaptapradip007@gmail.com

সারাাংশ

নবনীতা দেবসেন বাংলা কথাসাহিত্যের ক্রান্তদর্শী স্রষ্টা। পুরাণকেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চায় তাঁর অসামান্য অবদান। সৃজন হোক অথবা গবেষণা, রামায়ণের প্রতি তাঁর ছিল তীব্র আকর্ষণ। সেই আকর্ষণের সুফল রামায়ণ নির্ভর গল্প ও প্রবন্ধ। এইসব গল্প ও প্রবন্ধের মধ্যে উৎসারিত হয়েছে চেতনার বহুমাত্রিক আলো। তাঁর লেখা 'মূল রামায়ণ', 'রাজকুমারী কামবল্লী', 'অমরত্বের ফাঁদে', 'সীতার পাতাল প্রবেশ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে নবনীতা নির্মাণ করেছেন এক রামায়ণকেন্দ্রিক কথাবিশ্ব, যার সৌরভ পাঠককে নির্মল আনন্দে পরিপ্লুত করেছে। রামায়ণের প্রচলিত মিথকে বিচূর্ণ করে নতুন ভাবনায় জেগে উঠেছে তাঁর রামায়ণী গল্পগুলি। নতুন স্রোতে আর্দ্র হয়েছে রামায়ণের কথাশরীর।

শব্দ সূচক: অশোকবন, শতযোজন, তিলফুল, দিব্যশ্রী, বৈতরণী, কথাশরীর, স্নানমগ্না

ভূমিকা:

বাংলা সাহিত্যের কথাশরীর নির্মাণে নবনীতা দেবসেন একজন মহতী প্রতিভা। তাঁর কলম মহাকাব্যের আঁতুড়ঘর থেকে খুঁজে এনেছে রচনার উপকরণ। ভারতীয় জীবন ও সাহিত্যের তীর্থভূমি রামায়ণ। নবনীতার সাহিত্য চর্চার অন্যতম প্রিয় বিষয় এই এপিক গ্রন্থটি। তিনি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত রামায়ণগুলি থেকে নারী জীবনের যন্ত্রণাময় কাহিনিকে বেছে নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ যেমন লিখেছেন, তেমনই রামায়ণকেন্দ্রিক গল্প রচনাতেও তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ', 'চন্দ্র-মল্লিকা', 'মেয়েরা যখন রামায়ণ গায়', 'রামায়ণবিষবৃক্ষম্' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। তেমনি তাঁর উল্লেখযোগ্য রামায়ণী গল্প হল 'মূল রামায়ণ', 'রাজকুমারী কামবল্লী', 'অমরত্বের ফাঁদে', 'সীতার পাতাল প্রবেশ'। তাঁর এই সমস্ত রচনায় রামায়ণ ভাবনার সুচিন্তিত ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

নবনীতা দেবসেনের "সীতা থেকে শুরু" গল্পগ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য নারীর জীবন কাহিনির প্রতি আলোকপাত করা। গ্রন্থটির মোট তিনটি পর্ব। এই তিন পর্বে মোট বারোটি গল্প পরিবেশিত হয়েছে। আমাদের আলোচনার অভিমুখ নবনীতার রামায়ণকেন্দ্রিক কথাবিশ্ব, তাই আমরা 'পৌরাণিকী পর্ব' এর রামায়ণ নির্ভর গল্পগুলিকে আলোচনার জন্য বেছে নেব।

ভণিতাতেই লেখিকা নিজের গল্প রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। নবনীতা লিখছেন, "মহাকাব্য পড়তে পড়তে আমার কেবলই মনে হতো, এই বীর্য-বাহুবলসর্বস্ব পুরুষমানুষের যুদ্ধকাব্যের জগতে নারীর ঠাঁই বড় করুণ। সে লক্ষ্মীই হোক আর অলক্ষ্মীই। সীতাই হোক বা দ্রৌপদীই, তাড়কাই হোক বা শূর্পনখা, যেন দুঃখ পেতেই তাদের জন্ম। তাদের দুঃখের মূল্যেই মহাকাব্যের নায়কদের বীরোচিত গুণাবলী প্রমাণিত

হয়।"[১] চির বঞ্চিত, চির পীড়িত, দুঃখিনী নারীর কথা তিনি লিখলেন তাঁর এই গল্পগ্রন্থে। মূল কাহিনির সঙ্গে মিশে গেল আকাশ কুসুম কল্পনা। মূল কাহিনির বিস্তর কিছু বদল হল না। বরং কাহিনির সত্যকে মণ্ডিত করলেন কিছু সম্ভাবনাময় বিকল্প ভাবনায়। এতদিন যে নারীর ঠাঁই হয়নি পুরুষসর্বস্ব এপিক কাব্যগুলিতে তারাই এবার মহিমা ছড়ালেন গল্পের পরতে পরতে। রচিত হল বঞ্চিত নারীর জীবন মালা।

"সীতা থেকে শুরু"র প্রথম গল্প হল, 'মূল রামায়ণ'। 'মূল রামায়ণ'এর কাহিনি নেওয়া হয়েছে রামায়ণের 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড' ও 'সুন্দরকাণ্ড' থেকে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায়, ১৯৮৫ সালে। মূল ঘটনা কিঞ্চিত অদল বদল করে তিনি এই কাহিনি নির্মাণ করেছেন।

সীতা আছেন শতযোজন দূরের স্বর্ণলঙ্কায়। সেই স্বর্ণদ্বীপে গিয়ে সীতা উদ্ধারের জন্য সবাই মিলে হনুমানকে সাগর লঙ্ঘনের জন্য অনুরোধ জানাল। মহাবীর হনুমান পবন ও অঞ্জনার গর্ভজাত। তিনি এক লাফেই রাজসভা থেকে বনের মাঝে উপস্থিত হলেন। তার সঙ্গে ছিল "রাম-নামাঙ্কিত, সূর্যবংশের চিহ্ন সংবলিত, বহুমূল্য রত্নখচিত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি।"[২] এই নিয়ে হনুমান "জয় রামচন্দ্র" ধ্বনি দিয়ে শূন্যে উড়ে গেলেন এবং সোজা লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হলেন।

স্বর্ণলঙ্কার দ্বাররক্ষী ও অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন শ্রীমতী লঙ্কাদেবী। হনুমানের বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়ে তিনি ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। এরপর রাবণের প্রাসাদে যেতে আর কোনও বাধা ছিল না। রাজালয়ে প্রবেশের পরেই স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্য ও আর্কিটেকচারাল একসেলেন্স দেখে হনুমান বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। প্রাসাদের অন্দরমহলে ঘুমন্ত নারীদের সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছিল। এই মুগ্ধতার বশে সে সোনার খাটে রাবণের বাঁ পাশে শায়িতা স্বর্ণবর্ণা মন্দোদরীকেই সীতাদেবী বলে ভুল করে। পরে অশোকবনে সীতার দেখা পেলে তার বিভ্রম ঘোঁচে। অশোকের ছায়ায় চীরবসনা সীতা যেন এক অনুপম দেবীমূর্তি। সেই দেবীর এক পায়ে নূপুর। সেই নূপুর দেখে মহাবীর নিশ্চিন্ত হয় যে ইনিই সীতাদেবী।

সীতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে হনুমান তার লঙ্কায় পদার্পণের উদ্দেশ্য খোলসা করে বললেন, "মা জননী ! আমি আপনার স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের সেবক হনুমান। আপনাকে পতিগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি !"[৩] একথা শুনেও সীতা ভাবল এটা একটা খ্যাপা বাঁদর অথবা কোনও পাজি রাক্ষস হবে। অতপর মহাবীরের হাতে শ্রীরামের দেওয়া অঙ্গুরীয়টি দেখে সীতার মনে বিশ্বাস তৈরি হয়। সৌজন্য বিনিময় সাঙ্গ হলে সীতাদেবী তার পিঠে উঠে বসলেন। অশোকবন কাঁপানো প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে পবনপুত্র তৎক্ষণাৎ মহেন্দ্র পর্বতে প্রত্যাবর্তন করেন।

বীর হনুর এই অভূতপূর্ব কীর্তিতে সমগ্র বানরকুল হতবাক হয়ে যায়। শ্রীরামচন্দ্রও এই স্বর্গীয় আনন্দে বীর হনুকে অমরত্বের আশীর্বাদ দিয়েছেন। এমন সময় নড়ে উঠল বল্মীকের স্তূপ। আবির্ভূত হলেন আদিকবি। কাহিনি যেন ফের নতুন মাত্রা পেল।

রামচন্দ্র যে শ্রীনারায়ণের অবতার বাল্মীকি একথা মনে করিয়ে দিলেন শ্রীরামকে। সামান্য হনুর এই কাজ বাল্মীকির মতে নিছকই বাঁদরের বাঁদরামি। এই ঘটনাকে সম্মতি দিলে রাম-রাবণের যুদ্ধ হবে কেমন করে

আর ক্রান্তদর্শী মহাকবিই বা তাঁর রামায়ণ লিখবেন কী নিয়ে ! তাই সীতাকে ফের অশোকবনে রেখে আসতে হবে।

বাল্মীকির এমন পরামর্শে সীতাদেবী ক্রোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন। মহাকবিকে তিনি সজোরে ধমক দিলেন। এমনকি তাঁকে 'উইপোকামুনি' বলে ভর্ৎসনা করলেন। বলাবাহুল্য, সীতার এই ক্রোধোদীপ্ত, অগ্নিময়ী রূপের বিস্তারই নবনীতার লক্ষ্য ছিল। সীতা ও বাল্মীকির বাগ-বিতণ্ডা গল্পটিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। সীতা বাল্মীকির দিকে একটা অবজ্ঞার চাউনি দিয়ে হনুমানকে আদেশ দিলেন তাঁকে অশোকবনে রেখে আসবার জন্য। হনুমান আজ্ঞাবাহী সেবক এবং রামের অনুগত। তিনি পুনরায় সীতাকে নিয়ে লঙ্কা অভিমুখে উড়ে গেলেন।

বাল্মীকি আকাশ পথে সীতার এই লঙ্কা যাত্রার দৃশ্য দেখলেন বটে, কিন্তু অপমানের আগুনে তিনি জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলেন। সামান্য একজন মেয়েমানুষের ভয় ডর হীন তেজালো প্রত্যুত্তর তাঁকে অবাক করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর কাব্যে সীতার এই ঔদ্ধত্যের মধুর বদলা নেন।

লেখকের কল্পনার ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা হনুমানের অবাধ বিচরণ লক্ষ্য করি। সীতা উদ্ধারের জন্য সে ছিল একাই একশো। বাল্মীকি রামায়ণে আমরা দেখি হনুমান সাগর লঙ্ঘন করে সীতার সংবাদ এনেছিলেন। কিন্তু এই গল্পের হনুমান স্বয়ং সীতাকেই পিঠে চাপিয়ে মহেন্দ্র পর্বতে ফিরে এসেছেন।

সংস্কৃত রামায়ণে সীতার প্রত্যুত্তর ছিল, "রামের সঙ্গে তুমি এখানে এস, তাতেই মহৎ ফল হবে। আমি রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে স্পর্শ করতে চাই না, সে কারণে তোমার সঙ্গে যেতে পারি না। রাবণ আমাকে স্পর্শ করেছিল বটে, কিন্তু কি করব, তখন আমি অনাথা বিবশা ছিলাম। যদি রাম এখানে এসে দশানন ও অন্য রাক্ষসদের বধ করে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান তবেই তাঁর যোগ্য কাজ হবে।"[৩] রামের বীরত্ব ও খ্যাতি জগতময় প্রচারিত হোক এমনটিই চেয়েছিলেন বাল্মীকির সীতা। কিন্তু নবনীতার সীতা স্বয়ং বাল্মীকির সঙ্গেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন। কেননা তাঁর প্রতি দুর্দান্ত অবিচার করেছেন মহাকবি। টেক্সটের এই নবনির্মাণ লেখিকার প্রকৌশল।

যখন ভৎর্সনার সুরে বাল্মীকি বলেন, রাজবধূ হয়ে সীতা কেমন করে মুখপোড়া হনুমানের গলা ধরে ঝুলে পড়ল ! তাঁর কি পরপুরুষ স্পর্শে পাপের ভয়ও নেই। এর উত্তরে ক্রুদ্ধ সীতা বাল্মীকিকে আক্রমণ করে বলেন, "মুখ সামলে কথা বলবেন ঋষিমশাই ! জানোয়ারের আবার পরপুরুষ কী ? বাঁদর কি মানুষ ?"[৪] বোঝা যায় এই সীতা আদিকাল থেকে চর্চিত সরল মনোহরা নারী মূর্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নতুন মিথ নির্মাণের প্রচেষ্টা করছেন। মেয়েদের সতীত্ব কেন্দ্রিক সমাজ প্রচলিত ধারণার প্রতি তীব্র আক্রমণ করেছেন এতকালের অবলা সীতা। এই সীতা স্বাধীন এবং স্বয়ম্ভর। জ্ঞানবতী ও বুদ্ধিমতী নারী।

কৌতুক এই গল্পটির প্রাণভোমরা। নগরজীবন ও যন্ত্রসভ্যতার ছোঁয়া গল্পের পরতে পরতে। আধুনিক জীবনের ভোগতৃষ্ণা, কামনা ও যৌনাতুর দৃষ্টি এই গল্পের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। হনুমানের অন্তরে এবং চাহনিতেও যৌবনের তৃষ্ণা ঝরেছে। সুচারু কৌতুকের সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারার উচ্ছল প্রবাহে গল্পটি পুরনো ছাঁচ ভেঙে নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

“রাজকুমারী কামবল্লী” গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘শারদীয় নন্দন’ পত্রিকায় ১৯৯৫ সালে। বাল্মীকি রামায়ণের “অরণ্যকাণ্ড”-এর ১৭ থেকে ২০ সর্গে এই কাহিনি রয়েছে। নবনীতা সেই কাহিনিকেই কিঞ্চিত রদবদল করে আধুনিক নারী জীবনের উপযোগী করে তাঁর গল্পটি রচনা করলেন।

রাজকুমারী কামবল্লী হল লঙ্কেশ রাবণের বোন শূর্পনখা। দণ্ডকারণ্যে রাম-লক্ষণ-সীতা তেরো বছর ধরে বনবাস জীবন অতিবাহিত করছিলেন। একদিন হঠাৎ তাঁদের কুটিরদ্বারে এলেন রাজকুমারী শূর্পনখা। সীতা তখনও গোদাবরীর জলে স্নানমগ্না। লক্ষণ তিনজনের আহার প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। এমন সময় রামের কাছে উপস্থিত হয়ে শূর্পণখা তার কাম নিবেদন করলেন।

মহাকবি বাল্মীকি তাঁর কাব্যে শূর্পণখাকে কুরূপা, কর্কশকণ্ঠী, কামরূপিণী নারী বলেছেন। কিন্তু নবনীতা লিখেছেন, “যেন আকাশ থেকে খসে পড়া একটি স্থির বিদ্যুৎলতার মতো স্বর্ণবর্ণা একটি তন্বী তরুণী, তার পদ্মফুলের মতো আনন থেকে সরলতা এবং মাধুরীর দিব্য বিভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে চন্দ্রকিরণের মতো।”[৫] শূর্পণখার রূপ বর্ণনায় বাল্মীকির বিপ্রতীপে নবনীতার অবস্থান। নারীর রূপ বর্ণনায় বাল্মীকির পক্ষপাতিত্ব আছে বটে, কিন্তু কি রাক্ষসী, কি মানবী কি বানরী নারীর রূপ রচনায় অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন নবনীতা।

ছায়া নিবিড় অরণ্য সুন্দরীর বর্ণনা প্রাণময় হয়ে উঠেছে গল্পের কোনায় কোনায়। আর সীতা তো স্বয়ং ধরিত্রীর মেয়ে। প্রকৃতির ললিত মাধুর্য ছড়িয়ে রয়েছে তার আষ্টেপৃষ্ঠে।

গল্পের মূল ঘটনাটি সাজানো হয়েছে নারীর মুক্ত যৌনচেতনার দাবি জানিয়ে। পুরুষের কামনার আকাশে নারীর সদিচ্ছা যূপকাষ্ঠে বলি হয়। এই গল্পের কুমারী কন্যা শূর্পণখা মুক্ত যৌনতার পক্ষে সওয়াল করেছে। এরূপ স্পর্ধার যা পরিণাম হয়, তার জীবনেও সেই বিষাক্ত চিত্র এঁকে দিয়েছে পুরুষ। বাল্মীকি রামায়ণে শূর্পনখাকে কামনাময়ী কন্যা রূপেই আমরা আবিষ্কার করি। গল্পে শূর্পণখার সেই কামনাকে প্রেমের আতরে মুড়ে দিয়েছেন লেখিকা। কামবল্লী কুমারীর কামনাসঞ্জাত প্রেমের গল্প এটি।

শূর্পনখা রাজবংশের মেয়ে। যথার্থই রাজকুমারী। দীর্ঘ তপস্যার ফলে সে অলৌকিক দিব্যশ্রী লাভ করেছিল। আলোকলতার মতো উজ্জ্বল তার শরীর যেকোনো পুরুষেরই কামনার আধার হতে পারে। “বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের দেহে গোপন রোমাঞ্চ হল। তিনি সহসা কাম-শিহরিত হলেন।”[৬] রূপের কাছে নতজানু হয়ে পড়লেন মনুষ্যরূপী অবতার। শূর্পণখাকে তার দেবলোকবাসিনী বলে ভ্রম হল। সুন্দরীও নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন, দর্শনমাত্রই সে রামের প্রেমে জরজর। তাই তাঁকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সে উন্মুখ হয়ে আছে।

রাক্ষসী ও রামের উত্তর প্রত্যুত্তরে এই গল্প রসালো রূপ নিয়েছে। কামজ্বরে পীড়িতা এক নারীর সঙ্গে কৌতুক পরিহাসে মেতেছেন যুবক শ্রীরাম। সুতরাং যুক্তির পথ হারিয়ে ক্ষণিকের জন্য তিনি কামশরে বিদ্ধ হয়ে পড়লেন। রোমহর্ষণে তাঁর শরীরের সব লোম যেন খাড়া হয়ে উঠল। তারপরেই রামের মনে পড়ল সীতার কথা। এসময় সদ্যোস্নাতা সীতাকে দেখে শূর্পণখা বুঝতে পারলেন রাম বিবাহিত এবং এটিই তাঁর দ্বিধার কারণ।

ঈর্ষাকাতর কামিনী এবার ছুটলেন লক্ষণের কাছে। কোনরকম রাখঢাক না করেই লক্ষণের কাছে নিজেকে নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করলেন। যৌন যাপনে শূর্পণখা যে কতটা মুক্তমনের তরুণী এই গল্পের ভেতর তার অবাধ বিস্তার দেখেই সেটা অনুমান করা যায়।

একটি মহৎ প্রেমের করুণ পরিণতি যেন এই গল্পের অন্তরে থরে বিথরে সাজানো হয়েছে। এই প্রেমের উদ্গাতা একজন যুবতী নারী, তাই কি এমন করুণ পরিণাম ? লক্ষণ শূর্পণখাকে সরাসরি 'রাক্ষসকুলের বারাঙ্গনা' বলে উল্লেখ করেছেন। লক্ষণ যেন পুরুষতান্ত্রিক বিষবৃক্ষের ফল।

লক্ষণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মায়াবিনী শূর্পনখা শেষমেশ মায়ার আশ্রয় নেয়। লক্ষণের সামনেই সে রাম-সীতাকে কুটিরশুদ্ধ খেয়ে ফেলে। ভয়ার্ত লক্ষণ এবার প্রেমের নিকুঞ্জ সাজান। তারপর গভীর আবেগঘন মুহূর্তে চুম্বনরত অবস্থায় শূর্পণখার তিলফুলের মতো নাকটি দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেন। এ বিশ্বাসঘাতকতা মনুষ্যোচিত নয়। লক্ষণের এই রাক্ষসরূপ শিহরণ জাগায়। শূর্পণখার জীবনটাই বিষিয়ে গেল চিরজীবনের মতো। অঙ্গহানির পর সে বুঝতে পারল, প্রেমিক জাতটা আসলে পুরুষ।

শূর্পণখার অসহায় চিৎকারে সীতা তড়িঘড়ি ছুটে এসে ক্ষতস্থানে ওষুধের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। তারপর তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বলেন, "প্রতারনা, প্রবঞ্চনা, এ তো এই নারী জীবনের অঙ্গ, ভগ্নী কামবল্লী, এতে ভেঙে পড়তে নেই।"[৭] দেখা যায়, বিপদে দুই নারী একসুতোয় মিলেছে। কেননা নারী জীবনের গল্পটা সব রমণীর জন্যই একইরকমের সত্য। এই গল্পের শেষটুকু মর্মাহত হওয়ার মতো।

পুরুষের শত অবহেলার মাঝেও "রাজকুমারী কামবল্লী" গল্পটি নারীর নিজস্ব বিবৃতি নিয়ে উড্ডীয়মান থাকে।

"অমরত্বের ফাঁদে" গল্পটির সূতিকাগৃহ রামায়ণের "লঙ্কাকাণ্ড"। "লঙ্কাকাণ্ড" অনেক রামায়ণে "যুদ্ধকাণ্ড" নামেও পরিচিত। "যুদ্ধকাণ্ড"এর ৯৯ থকে ১০১ সর্গের কাহিনি অবলম্বনে এই গল্প নির্মাণ করা হয়েছে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় "শারদীয় দেশ" পত্রিকায়, ১৯৮৬ সালে।

গল্পের শুরুতে সীতা ও সরমা অশোকবনের মধ্যে ছায়ায় বসে কড়ি খেলছিলেন। ওদিকে রাম রাবণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেঁধেছে। এরকম সময় চেড়ীদের মারফৎ এলো সেই দুঃসংবাদ। রাবণের পরাক্রমে রাম ও লক্ষণ দুজনেই ধরাশায়ী হয়েছেন। রাক্ষসী চেড়ীদের কটাক্ষ ও কলহাস্যে জানকী সত্যি সত্যিই জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান ফিরলে ত্রিজটা রাক্ষসীকে সঙ্গে করে সীতা নিজেই পুষ্পক রথে চড়ে রাম-লক্ষণকে দেখতে গেলেন।

পুষ্পক রথে করে গোপনে সীতার এই যুদ্ধস্থলে আসার কথা মূল রামায়ণে নেই। এটুকু নবনীতার নতুন সংযোজন। এরপর বাল্মীকি রামায়ণে যন্ত্রনাবিদ্ধ বিলাপরত রামের কণ্ঠের কথাগুলি গল্পের মধ্যে যেন হুবহু গদ্যরূপ লাভ করেছে। সংস্কৃত রামায়ণে সুষেণ বৈদ্যের কাছে রামের বিলাপ অংশটি ছিল নিম্নরূপ—

"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।

তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।।
কিং নু রাজ্যেন দুর্ধর্ষ লক্ষণেন বিনা মম।
কথং বক্ষাম্যহং ত্বম্বাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম্।। (১০১। ১৪-১৫)

হা ভ্রাতর্মনুজশ্রেষ্ঠ শূরাণাং প্রবর প্রভো।
একাকী কিং নু মাং ত্যক্ত্বা পরলোকায় গচ্ছসি।। (১০১। ১৯-২০)”[৮]

ঠিক এইরকম ভাবেই গল্পের রাম কাতর ভাবে বলতে থাকেন, “সীতা গেছে যাক গে, অমন কত সীতাই আমার হবে, যদি কপালে বউ থাকে; কিন্তু লক্ষণ ভাইটি তো আর হবে না ?”[৯] নারীর প্রতি রামের এই বিদ্বেষী মনোভাব চিনিয়ে দেয় এক স্বার্থপর, পত্নী নিষ্ঠুর রামকে। সে রাম মানুষ নয়, পুরুষ। যেভাবে হোক নারীকে দোষারোপ করাই তাঁর কাজ।

সরলমতি সীতার মধ্যে আপামর ভারতবাসী একজন নারীর আদর্শ অন্বেষণ করে। গল্পের শুরুতে সীতার মুখে যে অপরিমেয় শান্তি বিরাজ করতে দেখি তার মূল কারণ হল, শ্রীরামচন্দ্রের জয় সম্পর্কে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস। অন্য কারোর তুলনায় সে তাঁর স্বামীকে কয়েক সহস্র গুন উচ্চে রাখে।

রামের দুঃসংবাদ শুনে সীতা জ্ঞান হারান। দিবস রজনী সীতা রামময় হয়েই বাঁচেন। সেই সীতা যখন রামের মুখে শুনলেন অযাচিত কথাবার্তা তিনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। তার কেবলই মনে হতে লাগল এ নিশ্চয়ই আসল রাম নয়, সাজানো কোন মায়াবী রাম।

পুরুষ সম্পর্কে নারীর ভ্রম ঘোঁচে না সহজে। পুরুষকে ধরে, পুরুষকে বিশ্বাস করে বাঁচতে চায় সে। সীতা যখন অগ্নিকুণ্ডে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে গেল অমনি স্বর্গ থেকে একটি ঢেঁকিতে করে নারদমুনি এগিয়ে এলেন। তাঁর মিষ্টি মধুর বাক্যে সীতা ফের বিশ্বাস করতে শুরু করল রামকে। তারপর দেখা গেল শ্রীরামচন্দ্র সত্যি সত্যি “সীতার উদ্ধার কিংবা আত্মার সংহার”[১০] শ্লোগান দিতে দিতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

গল্পের শেষবিন্দুতে দেখানো হয়েছে সীতাদেবী মহাকাব্যের নায়িকা হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে জীবনের কঠিন দুঃখকে মেনে নিয়েছেন। সীতা তো সামান্য তরুণী। রথী মহারথীরাও এই লোভ সামলাতে পারেন না। তাই মহাকাব্যের নায়িকার যা পরিণতি হয় সীতাকেও সেরূপ কষ্ট ও সহনশীলতার ভেতর দিয়েই এই বৈতরণী পার হতে হয়েছে।

“সীতার পাতাল প্রবেশ” গল্পটি রামায়ণের “উত্তরকাণ্ড” অবলম্বনে রচিত। উত্তরকাণ্ডের ৯৩ থেকে ৯৭ সর্গের কাহিনিকে আধুনিকতার আঁচলে মুড়ে লেখিকা এই গল্প লিখেছেন। “শারদীয় আজকাল” পত্রিকায় ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

লবকুশ সীতার দুই সন্তান। আশ্রমের মধ্যে বড় হয়েও যুদ্ধবিদ্যায় তারা বেশ পারদর্শী। দুই ভাইয়ের মধ্যে শাস্ত্রের চেয়ে অস্ত্রের আলোচনা বেশি হয়। এরা মহাক্ষত্রিয়, রাজসিক। তাই সাত্ত্বিক জীবনের প্রতি কোন আগ্রহ এদের ভেতর লক্ষ্য করা যায় না। আশ্রমবাসী সীতা ছেলেদের এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। “তিনি মাতা ধরিত্রীর সন্তান, যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর চিরদিনের বিরাগ, ঘোর বিতৃষ্ণা। শস্যরোপণ, বীজবপন, হলকর্ষণ, এসব হল মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার দিক। জীবনের শিল্প। আর অস্ত্রসজ্জা, অস্ত্রশিক্ষা, অস্ত্র তৈরি করা, এবং যুদ্ধ-এ হল তার বিপরীত। মৃত্যুর শিল্প।”[১১] শ্রীলঙ্কায় মানুষের এত মৃত্যু,

এত রক্ত দেখে সীতার মন যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে সরে যেতে চেয়েছিল। সেই হিসেবে এই আশ্রম তাঁর কাছে যেন রাজনৈতিক কূটকচালি মুক্ত এক ভূস্বর্গ।

কিন্তু এখানে এসেও ছেলেদের মধ্যে দুষ্টু-মিষ্টি অস্ত্র খেলা দেখে মন কেমন যেন হয়ে যায়। লবকুশ অশ্বমেধের ঘোড়া ধরেছিল। পরিণামে শুরু হল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ক্ষত্রিয়পুত্র যুদ্ধে ভয় পায় না। মূর্ছা যাওয়া হনুমান আর জাম্বুবানকে বন্দী করে নিয়ে তারা সীতার পায়ে ফেলে দিল। ছেলেদের এই কাণ্ড দেখে সীতা হতবাক হয়ে যান। তাঁর নিজেরই যেন মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা হয়। স্বয়ং রামচন্দ্রও এদের হাতে পরাজিত হয়ে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে বন্দী। সীতা টেলিপ্যাথি করে বাল্মীকিকে ডাকলেন। এই দুঃসময়ে এই মুনিঋষিই তাঁর বন্ধু।

আশ্রমে রাম সীতার সাক্ষাত হল বটে। কিন্তু সীতা সম্পর্কে তাঁর ঔদাসীন্য যে তিমিরে পড়েছিল, সেখানেই যেন পড়ে থাকল। রাজ্যে সুশাসন ফেরাতে একদিন অন্তঃসত্ত্বা সীতাকে তিনি বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। সেই কর্মকঠোর রামের মনে কোনরকম দয়ার উদ্রেক হল না।

সীতার সেবা ও করুণায় হনুমান ও জাম্বুবানের মনে অনেক আশা প্রত্যাশার সঞ্চার হয়েছিল। তারা সীতাকে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য রামচন্দ্রকে অনুনয় বিনয় করতে থাকে। পরের কথায় কান দিলে কী বিপদ হতে পারে রাম নিজেও সেটা বুঝলেন। তবু তাঁর মধ্যে কোনরকম নমনীয়তা দেখা গেল না।

রামের এই অসহনশীলতা সীতাকে জীবনে অনেক শিক্ষা দিয়েছিল। আর তাই অভিমানের রুদ্ধদ্বার তাঁর অন্তরকেও একটু একটু করে দৃঢ় করেছিল। তাই ইক্ষাকু বংশের জন্য চির মঙ্গল কামনা করেও বসুমতীর মেয়ে সীতা তৃণভূমি বনভূমিকেই নিজের স্বস্থান বলে দাবি করেন। রাম বুঝতে পেরেছিলেন, “এ সীতা সোনার নয়, লোহার। সীতা আর মাটির মানুষী নেই।”[১২] রামের অনড় মনোভাব ও অনাদরে সীতা ক্ষয়ে ক্ষয়ে বিন্দুবৎ হয়ে গেছিলেন। তাই চির অভিমানিনী নারী অযোধ্যাবাসীকে আর কোন সুযোগ না দিয়ে পাতালে প্রবেশ করলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কী পরিমাণে হেনস্থার শিকার হয়, “সীতার পাতাল প্রবেশ” গল্পটি যেন চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেয়। সতীদাহ, সহমরণ, বাল্যবিবাহ ও সতীত্বের পরীক্ষা দিতে দিতে একটা সমাজ যখন রসাতলে চলে যায়, তখন তার সমস্ত গরিমা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে। প্রেমময়ী, সরলবালা সীতার জীবনদানের মাধ্যমে এই গল্পে নারীর প্রতিবাদী দহন কথার প্রকাশ ঘটেছে।

রামায়ণ চিরকালীন কাব্য। নবনীতার কলমে সেই চিরকালীন গাথা উদ্ভাসিত হয়েছে তার চমকপ্রদ রশ্মি নিয়ে। আধুনিকতা গল্পগুলিকে সময়োপযোগী করেছে, কল্পনা ও কৌতুকে গল্পগুলি হয়ে উঠেছে সরস ও প্রাঞ্জল। রস পিপাসু নিবিড় পাঠকের মগজে এই গল্পগুলি আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র :

১. নবনীতা দেবসেন, ভণিতা, সীতা থেকে শুরু, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা লি, কলকাতা।

২. নবনীতা দেবসেন, মূল রামায়ণ, সীতা থেকে শুরু, পৃষ্ঠা-১৩, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা লি, কলকাতা।

৩. রাজশেখর বসু, সুন্দরকাণ্ড, বাল্মীকি রামায়ণ সারানুবাদ, পৃষ্ঠা-২৭৯, পঞ্চদশ মুদ্রণ ১৪২০, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা লি, কলকাতা।

৪. নবনীতা দেবসেন, মূল রামায়ণ, সীতা থেকে শুরু, পৃষ্ঠা-২০, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা লি, কলকাতা।

৫. নবনীতা দেবসেন, রাজকুমারী কামবল্লী, সীতা থেকে শুরু, পৃষ্ঠা-২৪, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা লি, কলকাতা।

৬. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫

৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৪

৮. রাজশেখর বসু, যুদ্ধকাণ্ড, বাল্মীকি রামায়ণ সারানুবাদ, পৃষ্ঠা-৩৭১, পঞ্চদশ মুদ্রণ ১৪২০, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা লি, কলকাতা।

৯. নবনীতা দেবসেন, অমরত্বের ফাঁদে, সীতা থেকে শুরু, পৃষ্ঠা-৪০, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা লি, কলকাতা।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৪

১১. নবনীতা দেবসেন, সীতার পাতাল প্রবেশ, সীতা থেকে শুরু, পৃষ্ঠা-৪৬, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা লি, কলকাতা।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩